ইউনিট
৪

মাছের আবাসস্থল

মাছ চাষের ক্ষেত্র হিসেবে পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম। পুকুর হচ্ছে চাষ যোগ্য মাছের আবাসস্থান যা সাধারণভাবে ছোট, অগভীর ও বদ্ধ একটি জলাশয়। পুকুর মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত আদর্শ পুকুর হবে আয়তাকার। আয়তন ২০-২৫ শতাংশ হলে তা পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত। পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে। পুকুরের স্থান এমন হতে হবে যা সহজে পানি নিষ্কাশন যোগ্য। পুকুরের মাটি হবে দোআঁশ, পলি দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ। মাছ চাষের পুকুরকে পুকুরের আয়তন, পানি ধারণ ক্ষমতা পানির স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতিপালনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণি বিন্যাস :স্থায়ী পুকুর এবং অস্থায়ী পুকুর। বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতি পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুকুরের প্রয়োজন হয়। যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাদেরকে আতুড় পুকুর বলে। সাধারণভাবে এ ধরনের পুকুরের আয়তন ১০-১৭ শতাংশ পর্যন্ত হয়। যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা বা আঙ্গুলে পোনা তৈরি করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। যে পুকুরে ধানী বা আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এই ইউনিটে মাছের পুকুর বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়, মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতকরণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : মাছের পুকুর
পাঠ - ৪.২ : পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়
পাঠ - ৪.৩ : মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন ও প্রস্তুতকরণ ও পোনা ছাড়ার পদ্ধতি
পাঠ - ৪.৪ : মাছের অভয়াশ্রম ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন
পাঠ - ৪.৫ : ব্যবহারিকঃ পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়

পাঠ-৪.১ মাছের পুকুর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পুকুরের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন ।
- একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন ।
- মাছের পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	আদর্শ পুকুর, ভৌত গুণাগুণ, রাসায়নিক গুণাগুণ, আঁতুর পুকুর, মজুদ পুকুর, লালন পুকুর ।

মাছ চাষের ক্ষেত্র হিসেবে পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম । পুকুর হচ্ছে চাষ যোগ্য মাছের আবাসস্থান যা সাধারণভাবে ছোট, অগভীর ও বদ্ধ একটি জলাশয় । পুকুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর পর্যন্ত হতে পারে । তবে মাছের চাষ উপযোগী মাটি ও পানির ভৌত গুণাগুণ সম্পন্ন ছোট ও মাঝারি আকারের পুকুর মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত ।

১ । আদর্শ পুকুর হবে আয়তাকার । আয়তন ২০-২৫ শতাংশ হলে তা পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ।
২ । পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে ।
৩ । পুকুরের স্থান এমন হতে হবে যা সহজে পানি নিষ্কাশন যোগ্য ।
৪ । পুকুরের মাটি হবে দোআঁশ, পলি দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ ।
৫ । পুকুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২.০ মিটার হলে ভালো ।
৬ । সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর মাছ চাষের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক ।
৭ । পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য পুকুরটি খোলা মেলা স্থানে হলে ভালো ।
৮ । আদর্শ পুকুর উত্তর-দক্ষিন মূখী হতে হবে যাতে সূর্যালোক বেশি পড়ে ।
৯ । পুকুরের তলায় কাদার পুরুত্ব ২০-২৫ সে.মি এর বেশি হওয়া ঠিক নয় । অন্যথায় এতে পচন ক্রিয়ার পানিতে প্রচুর দূষিত গ্যাস উৎপাদিত হয় ।
১০ । পুকুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো ।
১১ । আদর্শ পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ পরিমিত হতে হবে ।

মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ:

পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ মাছের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে । মাছের খাদ্য গ্রহণ, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন, বেঁচে থাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ অনুকূল মাত্রায় থাকা প্রয়োজন । পুকুরের পানির গুণাগুণকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় । যথা- ক । ভৌত গুণাগুণ এবং খ । রাসায়নিক গুণাগুণ

ক. ভৌত গুণাগুণ

১ । পুকুরের গভীরতা :

খুব বেশি অগভীর পুকুরে উদ্ভিদ জন্মায় । অন্য দিকে পুকুরের পানি গ্রীষ্মকালে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় ফলে মাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । আবার পুকুরের গভীরতা খুব বেশি হলে গভীর অঞ্চলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাঙ্কটন তৈরি হয় না এবং সেখানে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় ।

২। তাপমাত্রা:
পুকুরের তাপমাত্রা কমে গেলে মাছ খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার তাপমাত্রা অধিক হলেও মাছের ক্ষতি হয়।

৩। ঘোলাত্ব:
একটি ভালো পুকুরের পানি প্লাঙ্কটনের উপস্থিতি বা প্রাচুর্যতার জন্য অস্বচ্ছ হবে কিন্তু কাঁদার জন্য অস্বচ্ছ বা ঘোলা হবে না। কাদা কনার কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৪। আলো:
যে পুকুরের পানিতে সূর্যালোক বেশি পড়ে সেখানে সালোক সংশ্লেষণ ভালো হয় এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সে জন্য পুকুর এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক থাকে। অনেক সময় কচুরি পানা দ্বারা পুকুরের পানির উপরিভাগ আবৃত থেকে আলো প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। এরূপ পুকুরে মাছের উৎপাদন অনেক কমে যায়।

খ. রাসায়নিক গুণাগুণ

১। দ্রবীভূত অক্সিজেন:
পুকুরের পানিতে দুইভাবে অক্সিজেন দ্রবীভূত হতে পারে পানির উপরিভাগে সরাসরি বায়ুমন্ডল থেকে এবং পুকুরের জলজ উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে। ফাইটো প্লাঙ্কটনের সালোক সংশ্লোষণের মাধ্যমেই সিংহভাগ অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান কমে গেলে মাছ শ্বাস কষ্টে মারা যায়। অতিরিক্তি ফাইটোপ্লাঙ্কটন আছে এরূপ পুকুরে মেঘলা দিনে এবং রাত্রে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ফাইটোপ্লাঙ্কটন বা প্রাথমিক উৎপাদকের শ্বসন কার্য সম্পন্ন করার জন্য ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন রয়েছে। পুকুরে পানির অক্সিজেনের ঘনত্ব ৫ পি.পি.এম বা এর বেশি থাকা ভালো।

২। দ্রবীভূত কার্বনডাই অক্সাইড:
পুকুরের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য ফাইটোপ্লাঙ্কটন উৎপাদন হিসেবে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। সেজন্যই ফাইটোপ্লাঙ্কটনের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমান দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড পুকুরের পানিতে থাকা আবশ্যক। তবে অত্যধিক মাত্রায় দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড ও ফাইটোপ্লাঙ্কটন মাছের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ৬ পি.পি.এম এর বেশি হলে পানির অম্লতা বৃদ্ধি পায়।

৩। অ্যালক্যালিনিটি:
পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত ক্ষারীয় খনিজ সমূহের মোট ঘনত্বই হচ্ছে অ্যালক্যালিনিটি। সাধারণভাবে অ্যালকালাইন পানি প্রশম বা অম্লীয় পানির চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল। মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ ফসফরাসের উপস্থিতির জন্য হয়। ফসফরাস ফাইটোপ্লাঙ্কটন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪। পানির pH :
পানির pH মাত্রা জানার মাধ্যমে একটি পুকুরের মাছ চাষোপযোগী কি-না তা নিরূপন করা যায়। মাছ চাষে পুকুরের পানির pH ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো।

পুকুরের প্রকারভেদ
মাছ চাষের পুকুরকে পুকুরের আয়তন, পানি ধারণ ক্ষমতা পানির স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতিপালনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। নিম্নে পুকুরের উল্লেখযোগ্য শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করা হলো:

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণি বিন্যাস :
ক. স্থায়ী পুকুর এবং খ. অস্থায়ী পুকুর

ক. স্থায়ী পুকুর: এ ধরনের পুকুর অধিকতর গভীর হয় এবং এতে সারা বছর পানি থাকে। এদের মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে।

খ. অস্থায়ী বা মৌসুমী পুকুর : এ ধরনের পুকুর অগভীর এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮ মাস) পানি থাকে। বেলে মাটির পুকুর সাধারণত অস্থায়ী হয় ফলে পানি বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না।

২। আকারের উপর ভিত্তি করে শ্রেণি বিন্যাস:
বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতি পালনের জন্য ৩ ধরনের পুকুরের প্রয়োজন হয়।
ক. আঁতুড় পুকুর: যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাদেরকে আঁতুড় পুকুর বলে। সাধারণভাবে এ ধরনের পুকুরের আয়তন ১০-১৭ শতাংশ পর্যন্ত হয়।

খ. লালন পুকুর:
যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা বা আঙ্গুলে পোনা তৈরি করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। লালন পুকুরের আয়তন ২০-১০০ শতাংশ এবং গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হয়ে থাকে।

গ. মজুদ পুকুর :
যে পুকুরে ধানী বা আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুরের আয়তন ৩০ শতাংশের উপরে এবং গভীরতা ২-৩ মিটার হয়। মাছ চাষের জন্য এ ধরনের পুকুরই প্রধান পুকুর হিসেবে পরিচিত।

পুকুরের বিভিন্ন স্তর
পুকুরের পানির গভীরতার স্তর পুকুরের ভৌত গুণাবলীকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পানির বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। পুকুরের পানির স্তরকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-ক. উপরের স্তর, খ. মাঝের স্তর এবং গ. নিচের স্তর।

ক) উপরের স্তর: পুকুরের উপরের স্তরে অক্সিজেন বেশি পরিমান থাকায় মাছের খাদ্য ফাইটোপ্লাঙ্কটন এই স্তরে বেশি থাকে। কাতলা, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প এবং সরপুটি উপরের স্তরের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

খ) মাঝের স্তর : এই স্তরে দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং তাপমাত্রার পরিমান উপরের স্তরের চেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জুপ্লাঙ্কটন থাকে তবে ফাইটোপ্লাঙ্কটনও থাকতে পারে। রুই মাছ মাঝের স্তরে থাকে এবং খাদ্য গ্রহণ করে।

গ) নিচের স্তর: এই স্তরে তাপমাত্রা এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান সবচেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জু-প্লাঙ্কটন কীটপতঙ্গের র্লাভা, জৈব আর্বজনা, কেঁচো, শামুক ঝিনুক থাকে এবং খাদ্য গ্রহণ করে।
এছাড়া কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল স্তরেই বিচরণ করে। যেমন- তেলাপিয়া।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো, মাছের পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

পুকুর হচ্ছে চাষযোগ্য মাছের আবাস স্থান যা সাধারণভাবে ছোট, অগভীর ও বদ্ধ একটি জলাশয়। লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য আদর্শ পুকুরের কোনো বিকল্প নেই। পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ মাছের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে। পুকুরের ভৌত গুণাগুণগুলো হলো- পুকুরের পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, ঘোলাত্বও আলো, আকারের ওপর ভিত্তি করে পুকুর তিন ধরনের যেমন- আতুড় পুকুর, লালন পুকুর, মজুদ পুকুর। পুকুরের পানির স্তর তিন ধরনের যথা- উপরের মাঝের ও নিচের স্তর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন পুকুরের রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয়?

ক) আতুর পুকুর খ) লালন পুকুর

গ) মৌসুমী পুকুর ঘ) মজুদ পুকুর

২। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির pH কত হলো-

ক) ৩.৫ খ) ৪.৫-৬.৫

গ) ৬.৫-৮.৫ ঘ) ৮.০-১০.৫

পাঠ-৪.২ পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্লাঙ্কটন এর সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় কত প্রকার ও কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্লাঙ্কটন, ফাইটো প্লাঙ্কটন, জুও প্লাঙ্কটন।

পানিতে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান সকল জীব তথা উদ্ভিদ প্রাণি মাছের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। পুকুরে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণির পর্যাপ্ততা উক্ত পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে নির্দেশ করে। পুকুরে বসবাসকারী এসব জীব সম্প্রদায়কে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

১। প্লাঙ্কটন: প্লাঙ্কটন হলো পানিতে বিদ্যামান আণুবীক্ষনিক জীব। এরা মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। প্লাঙ্কটন দুই প্রকার যথা-উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন (ফাইটোপ্লাঙ্কটন) এবং প্রানি প্লাঙ্কটন (জুওপ্লাঙ্কটন)। উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন হলো মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রধান উৎস। এগুলো সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ। যেমন-স্পাইরোগাইরা, নাভিকুলা, এনাবেনা ইত্যাদি। অপর দিকে পানিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জলজ প্রাণি ও লার্ভা হলো জুওপ্লাঙ্কটন। ফাইটোপ্লাঙ্কটন এর পাশাপাশি জু প্লাঙ্কটনের আধিক্য পানির রংকে বাদামী, সবুজ বা হলদেটে সবুজ করে তোলে। ডেফনিয়া, সাইক্লোপস, ফিলিনিয়া ইত্যাদি জুওপ্লাঙ্কটনের উদাহরণ।

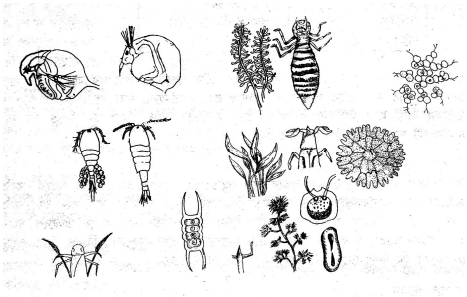

চিত্র: ৪.২.১: পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

২। নেকটন: জলজ প্রাণি যারা কিছুটা বড় আকারের পানিতে মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে সক্ষম এবং পানিতে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে তাদেরকে নেকটন বলে। যেমন- জলজ পোকা মাকড় এবং ওয়াটার ট্রিটল।

৩। বেনথোস : এরা পুকুরের তলদেশে কাদার উপরিভাগে অথবা কাঁদার মধ্যখানে বসবাসকারী জীব। যেমন-শামুক ঝিনুক ইত্যাদি।

৪। নিউসটন: পানির উপরিভাগে ঝুলে থেকে অথবা ভাসমান অবস্থায় সাঁতার রত বা বিশ্রামরত জীবকে নিউসটনে বলে। যেমন- প্রোটোজোয়া, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি।

৫। পেরিফাইটন: যে সকল ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রানি শিকড়যুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত বড় উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায় লেগে থাকে অথবা পানির তলদেশে শক্ত কোনো আশ্রয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে জীবন যাপন করে তাদেরকে পেরিফাইটন বলে।

৬। জলজ উদ্ভিদ: পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এরা প্রধানত দুই ধরনের। যথা- ক. শেওলা জাতীয় নিম্নতর উদ্ভিদ এবং খ. ফলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ।

ক. শেওলা জাতীয় নিম্নতর উদ্ভিদ: দেহ-গঠনের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১। প্লাঙ্কটন জাতীয় শেওলা: এ জাতীয় শেওলা অধিকাংশ খালি চোখে দেখা যায় না। এরা পানির সাথে একস্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। যেমন- পেন্ডোরিনা

২। তন্ত্রজাতীয় শেওলা: এ ধরনের শেওলা তন্তু বা সূতার মত অনেক লম্বা হয় এবং পানির ঠিক নিচেই এরা অবস্থান করে। বদ্ধ পানিতে এরা বেশি পরিমানে জন্মে এবং এদের রং ঘন সবুজ। যেমন- স্পাইরোগাইরা।

৩। নিমজ্জিত শেওলা: এরা অনেকটা দেখতে উন্নত উদ্ভিদের মত। এরা পানির নিচে মাটিতে লেগে থাকে এবং দেহ উপরের দিকে উঠে। সূর্যালোক পানির যে অঞ্চলে পড়ে সে অঞ্চলে এরা জন্মায়। যেমন- চারা

খ. ফুলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ: এদেরকে জীবন বৃত্তান্তের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। ভাসমান উদ্ভিদ: এসকল উদ্ভিদ পানির উপরে ভেসে থাকে এবং দল বেঁধে জন্ম। এদের মূল মাটিতে আটকানো থাকে না। যেমন- কচুরিপানা, ক্ষুদিপালা, কুটি পানা ইত্যাদি।

২। নির্গমনশীল উদ্ভিদ: এ সকল উদ্ভিদের মূল বা শিকড় পানির নিচে কাদার সাথে সংযুক্ত থাকে। এদের কান্ড, পাতা এবং ফুল পানির উপরিভাগে ভাসতে থাকে। যেমন- শাপলা, বিষকাটালী, পানিফল ইত্যাদি।

৩। লতানো উদ্ভিদ: এরা মূল বা শিকড় দ্বারা জলাশয়ের পাড়ে বা কম পানিতে লেগে থাকে। এদের দেহ লতার মত থাকে এবং কান্ড, পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ ইত্যাদি।

৪। ডুবন্ত উদ্ভিদ: এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে। এদের পাতা বা কান্ড বা ডাল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন- পাতাঝাঁঝি, কাঁটাঝাঝি, পাতা শেওলা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

পুকুরের পানিতে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান সকল জীব তথা উদ্ভিদ প্রানি মাছের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। এদের পর্যাপ্ততা উক্ত পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে নির্দেশ করে। পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়কে প্লাঙ্কটন, নেকটন, বেনথোস, নিউসটন, ফেরিফাইটন, জলজ উদ্ভিদে ভাগ করা যায়। জলজ উদ্ভিদকে আবার প্রধান দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- শেওলাজাতীয় নিম্নতর উদ্ভিদ এবং ফুলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ। ভাসমান উদ্ভিদ, নির্গমনশীল উদ্ভিদ, ডুবন্ত ও লতানো উদ্ভিদ হলো ফুলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বহু ধরনের?

ক) ২ ধরনের খ) ৩ ধরনের

গ) ৪ ধরনের ঘ) ৬ ধরনের

২। নিচের কোনটি ফাইট্রেপ্লোট্রেটন এর উদাহরণ?

ক) ড্রাফনিয়া খ) এনাবেনা

গ) কপি পোড ঘ) রটিফার

পাঠ-৪.৩ মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রস্তুতকরণ ও পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ চাষের পুকুর খনন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পুকুর খনন, প্রস্তুত করণ, জলজ উদ্ভিদ, রাক্ষুসে মাছ।

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য প্রস্তুতকরণ অথবা নতুন পুকুর খনন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক) নতুন পুকুর খনন

সফলভাবে মাছ চাষের জন্য কোন স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার যথাসম্ভব সেগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননই একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা একজন সম্ভাব্য মৎস্য চাষীকে সম্পন্ন করতে হয়। পুকুরের অবস্থান এবং মাটির গুণাগুণ মাছ চাষে সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি যথাসম্ভব আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমনভাবে করতে হবে যেন সারা বছর ১.৫ থেকে ২.০ মিটার পানি থাকে। পুকুর খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল ন্যূনতম ১.৫:২ রাখতে হবে। তবে বেলে মাটির পুকুরের ক্ষেত্রে ঢাল ১:৩ করতে হবে। তা না হলে পুকুরের পাড় অল্প দিনেই ভেঙ্গে যাবে। পুকুর খনন শেষে পুকুর তলায় বালু মাটির উপরে উর্বর ভালো মাটি বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানির ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগ ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিতলের ধারও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয় যাকে বকচর বলে। পুকুরের তলদেশ সমান অথচ একদিকে কিছুটা ঢালু রাখতে হবে। নতুন পুকুর খননের পর পুকুরের পাড়ের মাটি দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করে দিতে হবে এবং পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে পাড় ভাঙবে না এবং বর্ষার সময় পাড়ের মাটি ক্ষয় হবে না।

মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতকরণ

মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি বা চাষের উপযোগী করা মাছ চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছ মজুদের পূর্বে বিদ্যমান পুকুর সংস্কার করে নিলে মাছ বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে এবং রোগ বালাই কম হয়। ফলে মাছের উৎপাদন বেশি হয় এবং মৎস্য চাষী লাভবান হন। পুকুর প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ:-

১। পুকুরের পাড় এবং তলদেশ মেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে অথবা বর্ষাকালে বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে বা রাক্ষুসে মাছ ঢুকতে পারে। তাই পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে অবশ্যই তা মেরামত করতে হবে। মেরামতের সময় পাড় উচু করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় বড় গাছ পালা রাখা উচিত নয় আর যদি থাকে তাহলে ছোট ছোট করে রাখতে হবে। এতে করে পুকুরে সূর্যালোক পড়বে এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হবে। পুকুর যদি পুরানো হয় তাহলে তলায় অতিরিক্ত কাঁদা তুলে ফেলতে হবে।

এ কাজটি পুকুর শুকিয়ে সহজে করা যায়। মাছ চাষের পুকুর ৩-৪ বছর পর পর একবার শুকানো উচিত। পুকুর শুকানোর পর কড়া রোদে তলায় ফাটল ধরাতে হবে। সম্ভব হলে পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুকুরের তলদেশ থেকে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় দূর হবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকবে। এরপর পুকুরের তলায় একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে জাল টানতে এবং মাছ ধরতে সুবিধা হয়।

২। জলজ আগাছা দমন

পুকুরের ভিতরে ও পাড়ে বিভিন্ন ধরনের আগাছা যেমন-

খুদিপানা, কচুরিপানা, কলমিলতা, হেলেঞ্চা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মাছ চাষে ভালো উৎপাদন পেতে হলে জলজ আগাছা ভালোভাবে দমন করা প্রয়োজন। কারণ জলজ আগাছা পুকুরে দেওয়া সার শোষন করে নেয় এবং পুকুরের সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন- রাক্ষুসে মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। জলজ আগাছা তিনভাবে দমন করা যায়। যেমন- ক) যান্ত্রিক উপায়ে বা কায়িক শ্রমের দ্বারা দমন; খ) রাসায়নিক উপায়ে দমন এবং গ) জৈবিক উপায়ে দমন।

যান্ত্রিক উপায়ে দমনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কাটার যন্ত্র যেমন- কাটি ব্যবহার করে পানির নিচের ভাসমান ও নির্গমনশীল ও লতানো উদ্ভিদ কেটে দমন করা হয়। রাসায়নিক উপায়ে দমনের ক্ষেত্রে কপারসালফেট, কপার সাইট্রেট ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ দমন করা যায়। জৈবিক উপায়ে দমনের ক্ষেত্রে গ্রাস কার্প, থাই সরপুঁটি, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ দ্বারা জলজ উদ্ভিদ দমন করা হয়।

৩। রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ

যে সব মাছ অন্য মাছকে খেয়ে ফেলে তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। যেমন- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি। এছাড়া পুঁটি, চাপিলা, চান্দা ইত্যাদি অবাঞ্চিত মাছ চাষযোগ্য মাছের খাবার, জায়গা এবং অক্সিজেনে ভাগ বসায়। এতে করে চাষযোগ্য মাছের উৎপাদন কমে যায়। নিম্নের যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়-

ক) জাল টেনে: পুকুরের পানি কম থাকলে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা যায়।

খ) মাছ মারার বিষ প্রয়োগ করে: এক্ষেত্রে, মাহুয়ার খৈল অথবা রোটেনন ব্যবহার করা হয়। এসব দ্রব্য পুকুরে ব্যবহার করা হলে মাছ শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সে.মি. গভীরতায় পানির জন্য প্রতিশতাংশে ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন বা ৩ কেজি মাহুয়ার খৈল ব্যবহার করতে হবে। বিষ প্রয়োগের পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। বিষ প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর্যন্ত পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না।

গ) পুকুর শুকিয়ে: পুকুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা যায়। অনেক মাছ পুকুরের তলায় কাদায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই প্রখর রোদে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র: ৪.৩.১: পুকুরে চুন প্রয়োগ

৪ । চুন প্রয়োগ:

পুকুর শুকানোর পর পুকুরের তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হবে । পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে চাষের দিন চুন ছিটিয়ে দিতে হবে । এঁটেল মাটির জন্য প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি এবং বালি মাটির জন্য ০.৫ থেকে ১.০ কেজি চুনা পাথর বা কৃষি চুন পুকুরে তলদেশে প্রয়োগ করতে হবে । পুকুরে পানি থাকলে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বা ড্রামে চুন গুলার পর ঠান্ডা হলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

পুকুরে চুন প্রয়োগের উপকারিতা: ১ । চুন পানির pH ঠিক রাখে ২ । চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় । ৩ । মাছের রোগ বালাই দূর করে । ৪ । পানির ঘোলাত্ব কমায় ও পানি পরিস্কার রাখে । ৫ । সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে । পুকুরের পানির pH মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমান নির্ভর করে । নিচে pH মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো-

সারনি; পুকুরে চুন প্রয়োগের মাত্রা:

পানির pH মান	চুনের (পাথর) পরিমান (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয় ।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫ । সার প্রয়োগ

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় । মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে জু-প্লাঙ্কটন এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটন । সার প্রয়োগের ফলে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-পটাশিয়াম, ফসফরাস পানিতে মিশে । এসব পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপ্লাঙ্কটন তৈরি হয় । আর ফাইটোপ্লাঙ্কটনের উপর নির্ভর করে জু-প্লাঙ্কটন তৈরি হয় । পুকুরে সাধারণত জৈব সারগুলো হলো গোবর মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি । আর অজৈব সারগুলো হলো ইউরিয়া, টিএসপি, এম ও পি ইত্যাদি । সাধারণত চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয় । রোদ্রোজ্জ্বল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত । সার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

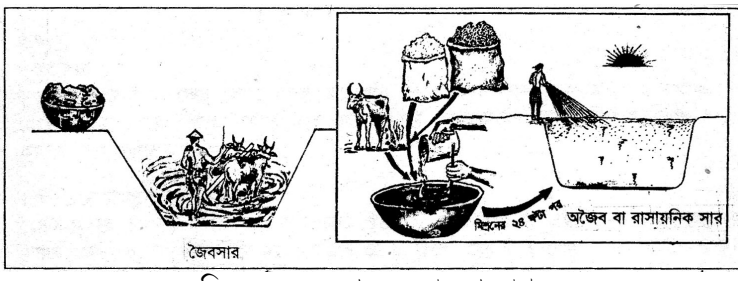

চিত্র: ৪.৩.২: পুকুরে সার প্রয়োগ

পুকুরে জৈব সার প্রয়োগের মাত্রা:

সারের নাম	মাত্রা (প্রতি শতাংশে)
গোবর	৫-৭ কেজি
মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি

পুকুরে অজৈব সার প্রয়োগের মাত্রাঃ

সারের নাম	মাত্রা (প্রতি শতাংশে)
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টি এস পি	৫০-৭৫ গ্রাম
এমওপি	২০ গ্রাম

৬। প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পোনা মজুদের পূর্বেই পুকুরে সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিত পরীক্ষা করা যায়। যেমন - ক) সেক্কিডিস্ক পরীক্ষা, খ) হাত পরীক্ষা এবং গ্লাস পরীক্ষা। পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় খাদ্য তৈরি হয়নি আরও ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাদ্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র: ৪.৩.৩: গ্লাস পরীক্ষা

৭। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার পর রাক্ষুসে বা অবাঞ্চিত মাছ দূর করার পর পোনা মজুদের পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করতে হবে। পোনা মজুদের ১ দিন পূর্বে পুকুরে হাপা স্থাপন করে বা বালতিতে অথবা পাতিলে পুকুরের পানি দিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এ সময়ে পোনা মারা না গেলে বোঝা যাবে পুকুরের পানিতে কোনো বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনা পরিবহনের বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ একমাত্র সুস্থ ও সবল পোনা মাছ চাষে সফলতা আনতে পারে। পোনা পরিবহনের সময় দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন- ক) অক্সিজেনের অভাবে যেন পোনা পানির উপরে ভেসে না উঠে এবং খ) পরিবহনের সময় যেন পোনা আঘাত প্রাপ্ত না হয়। দূর দূরান্ত থেকে পোনা পরিবহন একটি কষ্টসাধ্য কাজ। তাই নিকটবর্তী কোনো সরকারী বা বেসরকারী হ্যাচারি বা নার্সারি খামার হতে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। দূরবর্তী স্থান থেকে পোনা পরিবহন করতে হলে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। এক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগের ৩ ভাগে ১ ভাগ পানি আর ২ ভাগ অক্সিজেন দিয়ে ভর্তি করে পোনা পরিবহন করতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় যাতে মারা না যায় অথবা কম মারা যায় সেজন্য পোনাকে টেকসই করে নিতে হয়। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এ জন্য পোনা ভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। তখন অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে।

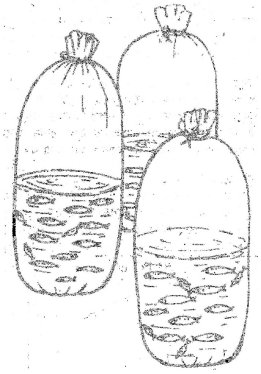

চিত্র: ৪.৩.৪: পোনা পরিবহন

চিত্র: ৪.৩.৫: পোনা ছাড়া

ফলে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। অত:পর পলিব্যাগ বা পাত্র কাজ করে আস্তে আস্তে এর ভিতরে পুকুরের পানির ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাগুলোকে শোধন করে নিলে ক্ষতিকারক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত থাকলে তা থেকে পোনা মুক্ত হবে এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। পাতিলে বা বালতিতে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবন মিশিয়ে তাতে প্রতিবারে ৩০০-৫০০টি পোনা আধা মিনিট চুবায়ে রেখে গোছল করাতে হবে। একবার তৈরিকৃত মিশ্রণে ৪-৫ বার শোধন করা যাবে। পুকুরের আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে পোনা ছাড়তে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরে বা মৎস্য খামার পরিদর্শন করে পুকুর প্রস্তুতকরণ এবং পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

সফলভাবে মাছ চাষের জন্য কোনো স্থানে পুকুর খনন করার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পুকুর প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন- ক) পুকুরের পাড় এবং তলদেশ মেরামত দূরীকরণ, খ) জলজ আগাছা দমন গ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ ঘ) চুন প্রয়োগ ঙ) সার প্রয়োগ চ) প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা এবং ছ) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করে। পোনা ছাড়ার পূর্বে মাছের পোনা পরিবহনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ একমাত্র সুস্থ ও সবল পোনাই মাছ চাষের সফলতা আনতে পারে। দূর থেকে পোনা পরিবহনের সময় অক্সিজেন ভর্তি পলিব্যাগে পোনা পরিবহন করা উচিত। পোনা পরিবহনের আগে পোনাকে টেকসই করে নিতে হয় যেন না মারা যায়। পোনা পুকুরে সরাসরি ছাড়া যাবে না। ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পলিব্যাগ বা পাত্রের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হলে পোনা ছাড়তে হবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা অবস্থায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। মাছ চাষের জন্য পুকুরের আকার কেমন জলে ভাল হয়?

ক) আয়তাকার খ) যে কোন আকৃতির

গ) বগধিকার ঘ) গোলাকার

২। দিনের কোন সময়ে মাছের পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত?

ক) বিকাল বেলা খ) দুপুর থেকে সন্ধ্যা

গ) রাত থেকে ভোর ঘ) সকাল থেকে দুপুর

পাঠ-৪.৪ মাছের অভয়াশ্রম ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৎস্য অভয়াশ্রমের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অভয়াশ্রম, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, শাস্তি, জরিমানা

মাছের অভয়াশ্রম

নদী মাতৃক বাংলাদেশ জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট, বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়) যার মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর। আরও রয়েছে সুবিশাল সামুদ্রিক জলাশয় (বঙ্গোপসাগর) যার আয়তন হচ্ছে ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই হচ্ছে মুক্ত জলাশয়। যেমন- নদী-নালা, খাল-বিল, সুন্দরবনের জলাভূমি, কাপ্তাই লেক, প্লাবন ভূমি। যার মোট আয়তন হচ্ছে ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর। অপরদিকে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে মাত্র ১২ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, হাওর ও চিংড়ি খামার। এদের মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৮.৩৪ লক্ষ হেক্টর। আমাদের এই বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে এবং বাকী ২০ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়সমূহে অতীতে প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। ষাটের দশকে এর পরিমান ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ নদীতে অপরিকল্পিত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন বর্তমানে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৫% এ। বাকি উৎপাদনের ৪৭% আসে বিভিন্নবাদ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৮% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপণ্ন, ২৮টি বিপণ্ন ও ১৪টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় হতে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি বলে। (যেমন- সরপুঁটি, মহাশোল, বাঘাআইড়)। যে সকল প্রজাতি অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। আরও যে সকল প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বলে।

বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ অবাদ প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উপাদান বৃদ্ধি এবং জলজ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের অভয় আশ্রম বলতে বোঝায় কোনো জলাশয় যেমন- হাওর, বাওড়, বিল বা নদীর কোনো একটি অংশ যেখানে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীনমুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২ টি অভয় আশ্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এসকল অভয়াশ্রমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্ত প্রায় এবং বিপন্ন প্রজাতির মাছ যেমন মেনি, রানী, চিতল, ফলি, গুতুম, বামোস, কালি বাউস, টেংরা, আইড়, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, গজার, বাইম ইত্যাদির উৎপাদন এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের গুরুত্ব:

১। অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা যায়।

২। মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।

৩। অভয়াশ্রমের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।
৪। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা যায়।
৫। জলজ পরিবেশে মাছের জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করা যায়।
৬। মৎস্য অভয়াশ্রম প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধি করা যায়।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য খাতটি আবহমান কাল হতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু প্রাকৃতিক এবং মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কতিপয় কারণ মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায়। ফলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ণ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। তাই মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের বিষয়কে বিবেচনা করে মৎস্য বিষয়ক কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জলাশয় থেকে অধিক মাত্রায় মৎস্য আহরণ করা হয়েছে। জলাশয় থেকে অধিক মাত্রায় মৎস্য আহরণ এবং অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণের ফলে মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। প্রজনন মৌসুমে অবাধে ডিমওয়ালা মাছ, ডিম পোনা, ধানী পোনা, রেণু পোনা নিধন, কারেন্ট জালের ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগের কারণে বর্তমানে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

বাংলাদেশের জলসম্পদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশব্যাপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, হাওড়-বাওড় ও প্লাবন ভূমি। এ ছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের সুবিশাল জলরাশি। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিশ এ্যাক্ট-১৯৫০, যা সাধারণভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ নামে পরিচিত। নির্বিচারে পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছ নিধন মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধিতে প্রধান অন্তরায়। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে এ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ নিম্নরূপ-

১। এ আইনে মাছ বলতে সকল কার্টিলেজিনাস, জেলি ফিশ, প্রণ, শ্রিম্প, এমফিরিয়ানস, টরটয়েজ, টারউলস, ক্রাস্টাসিয়ান, মোলাস্বস এ্যানিম্যালস এবং ইকাইনোডার্স এর জীবন চক্রের সকল ধাপকে বুঝাবে।
২। এ আইনে ফিশারি বলতে সকল প্রকার জলাশয়, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, মুক্ত বা আবদ্ধ, স্রোতশ্বী বা স্থির, আহরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড জড়িত। তবে কৃত্রিম অ্যাকুরিয়াম উক্ত আইনের আওতাভূক্ত হবে না।
৩। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি বছর -
ক) জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সে.মি (৯ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া।
খ) নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চ) এর ছোট আকারের ইলিশ (যা জাটকা নামে পরিচিত)
গ) নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইর মাছ ধরা নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।
৪। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সুযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতিবছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ শে আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাক বা দম্পতি মাছ ধ্বংস বা ধরা এবং ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।
৫। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরন করা যাবে না; এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপন সীজ, অপসারণ বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৬। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতিত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরুপ অবকাঠামো গ্রহণ করা যাবে না।

৭। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্য কোনো উপায়ে মাছ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা যাবে না।

৮। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৯। অভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় জলাভূমিতে বন্ধুক বা তীর ধনুক ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

১০। ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ : সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলোক জেন্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত তেতুলিয়া নদীর ১০০ কিলোমিটার এলাকা, ভোলা জেলার মদনপুর। চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনার শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার এবং প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকায় কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

১১। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ : ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার শাহেরখালী/হাইতকান্দি পয়েন্ট, ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার উত্তর তজুমুদ্দিন/পশ্চিম সৈয়দ আহলিয়া পয়েন্ট, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া গন্ডামারা পয়েন্ট এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপালি পয়েন্ট সমূহের অর্ন্তগত প্রায় ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রজনন ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর (১-১০ আশ্বিন) পর্যন্ত ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

১২। শাস্তি: ক) প্রথম বার আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা জরিমানা।

খ) পরবর্তিতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপেক্ষ ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা।

১৩। উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ বা চিংড়ির পোনা আহরণ নিষিদ্ধ।

১৪। আইন ভঙ্গকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ওয়ারেন্টে এ্যারেস্ট করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরকে দেখাবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় যার মোট আয়তন প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর। আরও রয়েছে সুবিশাল বঙ্গোপসাগর যার আয়তন ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। কোনো জলাশয় যেমন-হাওড়, বাওড়, বিল বা নদীর কোনো একটি অংশ যেখানে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করাকেই মাছের অভয়াশ্রম বলে। এসব বিবেচনা করে ১৯৫০ সালে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রণয়ন করেছে সরকার। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইন ভঙ্গকারীকে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। ইলিশ প্রজনের ক্ষেত্র সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর কোন সময় ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

ক) ১-২৩ সেপ্টেম্বর খ) ১৫-২৪ সেপ্টেম্বর গ) ১৫-২৪ শে অক্টোবর ঘ) ১-২০ শে নভেম্বর

পাঠ-৪.৫ ব্যবহারিক : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়:

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের নিজস্ব এবং সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফাইটো প্লাক্টটন উৎপাদনের জন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের ফলে জলাশয়ে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তাকে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন হলো মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সেকিডিস্ক (২০ সে.মি. ব্যাস যুক্ত টিনের একটি সাদা কালো থালা)
২। সূতা
৩। স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস।
৪। ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

কার্য পদ্ধতি

পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বেই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটি করা যায়। যেমন-

ক) সেকি ডিস্ক পরীক্ষা: এ ক্ষেত্রে ২০ সে.মি. ব্যাসযুক্ত টিনের একটি কালো থালা (যাকে সেকিডিস্ক বলে) সূতা দ্বারা পানিতে ডুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সে.মি. গভীরতায় থালা না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সে.মি এর অধিক গভীরতায় সেকিডিস্ক দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার অনেক কম।

খ) হাত পরীক্ষা: পুকুরের পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমান মতো প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে।

গ) গ্লাস পরীক্ষা: একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস দিয়ে পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা বাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকার মতো দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমান মতো প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়নি তবে আরো ২-৪ দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে। এর পরও যদি খাদ্য তৈরি না হয় তাহলে পুনরায় পরিমান মত সার প্রয়োগ করতে হবে।

এবার প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়ের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন এবং প্রয়োজনীয় চিত্র অংকন করুন।

সতর্কতা

১। সেকিডিস্ক এবং সূতার যেন কোনো প্রকারের ক্ষতি না হয় লক্ষ রাখতে হবে।
২। গ্লাস পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্লাস যেন না ভাঙ্গে সে দিকে নজর রাখতে হবে।
৩। পরীক্ষাগুলোর তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জালাল সাহেবের বাড়ির পাশে তিনটি পুকুর আছে। এগুলোর মধ্যে তিনি মাছ চাষ করবেন ঠিক করেছেন। এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে মৎস্য কর্মকর্তা ওনাকে মাছ চাষের জন্য একটি আদর্শ পুকুর কেমন হবে তার ধারণা প্রদান করেন। চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন্ ধরনের পুকুরে লাগবে সে ধারনাও তিনি লাভ করেন।

ক) মাছ চাষ বলতে কি বোঝায়।

খ) মাছ চাষের জন্য একটি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য কিরূপ হওয়া উচিত?

গ) পুকুরের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ কীভাবে মাছ চাষকে প্রভাবিত করে লিখুন?

ঘ) চাষকৃত মাছের আবাস ও বয়সের উপর ভিত্তি করে জালাল সাহেবকে কত ধরনের পুকুর তৈরি করতে হবে লিখুন।

২। হারুন সাহেব তার পুকুরে দীর্ঘদিন মাছ চাষ করছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন বিভিন্ন সময়ে পুকুরের পানির রং এ পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারলেন পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় এই রং পরিবর্তনের মূল কারণ।

ক) বাসস্থানের ভিত্তিতে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় কত ধরনের উদাহরণ দিন।

খ) পুকুরে বিদ্যমান প্লাঙ্কটনে উপস্থিতি পুকুরের পানির রংকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এদের উৎপাদন বাড়ানো যায়?

গ) পুকুরে বিদ্যমান জলজ উদ্ভিদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিন ।

ঘ) হারুন সাহেব কি ভাবে একটি আদর্শ পুকুর তৈরি করবেন- মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শের আলোকে বিশ্লেষন করুন।

৩। বর্তমানে অনেকেই মৎস্য চাষ করে স্বনির্ভর হচ্ছে। বেকার যুবকেরা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরেজমিনে পরিদর্শন মৎস্য চাষের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক।

ক) রাক্ষুসে মাছ কাকে বলে?

খ) সফল ভাবে মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন সম্পর্কে লিখুন।

গ) মৎস্য পুকুরে কীভাবে সার প্রয়োগ করা যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায় লিখুন।

ঘ) মৎস্য চাষের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ-বিশ্লেষন করুন।

৪। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য চাহিদা বাড়ায় সরকার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের উচিত সরকারের সর্বাত্মক সহযোগীতা করা।

ক) মাছের অভয়াশ্রম বলতে কী বুঝায়?

খ) বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের উৎস সম্পর্কে ধারণা দিন।

গ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চললে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে"-উক্তিটি বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ৪.১ : ১। ক ২। গ

উত্তরমালা- ৪.২ : ১। ঘ ২। ক

উত্তরমালা- ৪.৩ : ১। ক ২। ঘ

উত্তরমালা- ৪.৪ : ১। খ